মতিলাল শীল

জলধর মল্লিক

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

বৈদেশিক বাণিজ্যে সেকালের বাঙালি ১৩
জন্মকথা ও বাল্যকাল ২৪
বিবাহ ও দেশভ্রমণ ২৬
বাণিজ্যিক বোধের সূচনা ও বিপুল বিকাশ ২৮
সেরা বাঙালি বণিক হওয়ার পথে ৩২
ধর্মাধর্ম বোধ ৪৭
অন্তিম অধ্যায় ৫২
মানবদরদী মতিলাল : ৫৩
ক. দরিদ্রজনের সাহায্যার্থে বেলঘরিয়ায় অতিথিশালা ও ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠা ৫৩
খ. চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক অনন্য দাতা ৫৫
গ. সমাজ-সংস্কারের এক নির্ভীক সৈনিক ৬০
ঘ. জনগণের সুবিধার্থে গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাট নির্মাণ ৬৭
ঙ. শিক্ষা প্রসারে উজ্জ্বল ভূমিকা ৬৮
সমাপ্তিকথন ৮০
পরিশিষ্ট : মতিলাল শীলের বংশলতিকা ৯৫

।। মুখবন্ধ ।।

বাংলায় বরণীয়, স্মরণীয়, কৃতি বঙ্গসন্তানদের জন্মদিন বা তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়ে থাকে নানাভাবে। এইসব বরণীয় বঙ্গসন্তানদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিক, নানাক্ষেত্রের শিল্পী, শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদরা আছেন। আর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ তো আছেনই। এই ধরণের কৃতি বঙ্গসন্তানদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করাটা অবশ্যই একটা শুভ উদ্যোগ, একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। যাদের কৃতকর্মের ফলে সমাজের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটে, তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করলে আজকের বালক, কিশোর, তরুণরা নিজ নিজ অভিরুচি, আগ্রহ অনুযায়ী সমাজের কোনো না কোনো দিকে কিছু অবদান রেখে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়, ভবিষ্যত জীবনে কিছু একটা করে দেখাতে উৎসাহিত হয়। এর ফলে সমাজের ইতিবাচক অগ্রগতি সঞ্চারের সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কিন্তু দেখা যায়, এই সকল বরণীয়, স্মরণীয় বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে কোনো বণিকশ্রেষ্ঠ বা শিল্পোদ্যোগীর নাম খুঁজেই পাওয়া যায় না। একটা জাতি কিংবা একটা রাজ্য অথবা দেশকে এগিয়ে যেতে হলে অন্যান্য অংশের কৃতি মানুষদের পাশাপাশি ব্যবসাবাণিজ্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে যারা কিছু অবদান রেখে গেছেন, তাদেরকেও সমান সম্মান, সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কোনো সমাজ, কোনো জাতি, কোনো রাজ্য, কোনো দেশ উন্নত মানের ব্যবসাবাণিজ্য বা শিল্প

ব্যতিরেকে সামগ্রিক ভাবে বিশ্বের দরবারে অগ্রসর হিসাবে পরিগণিত হতে পেরেছে বলে এমন উদাহরণ, এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত কোথাও সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা নেই। ব্যবসাবাণিজ্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে কৃতি বঙ্গসন্তানদের বিষয়ে সজাগতার অভাবে সাধারণ ভাবে এখনকার বাংলার তরুণ সমাজ এই ক্ষেত্রে কিছু করার কথা ভাবতেই পারে না। চাকুরিই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে একধরণের ভ্রান্ত ধারণার, যার ফল হয়েছে বিষময়। কেবল আজকের তরুণ সমাজই নয়, তাদের অভিভাবকরাও মনে করেন অসাধু উপায় ছাড়া ব্যবসাবাণিজ্যে বা শিল্পে ইতিবাচক কিছু করে দেখানো সম্ভব নয়। আরও মনে করা হয়, এসব ক্ষেত্রে কিছু করতে হলে শুরুতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সততা, পরিশ্রম, বুদ্ধিকে মূলধন করে একেবারে পথের ধুলো থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যে বঙ্গসন্তানগণ একসময় বাংলার বাণিজ্যের জগতে উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন কলকাতার রামদুলাল দে, মতিলাল শীলের মতো উনিশ শতকের বণিকবৃন্দ। তেমনি বিশ শতকে শিল্পের ক্ষেত্রে এমনই নজির রচনা করে গিয়েছেন হাওড়ার আলামোহন দাস। এমনি বরণীয় বঙ্গসন্তান আরও আছেন যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কথাগুলি যে কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়, সেটি প্রমাণ করার স্বার্থেই এই গ্রন্থে উনিশ শতকে মতিলাল শীলের মতো বণিকশ্রেষ্ঠের জীবন ও কর্মের পাশাপাশি মানবকল্যাণে তার ঐতিহাসিক অবদানের একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্যোগ কতটা সফল হয়েছে—তা বিচারের ভার বরং পাঠকের ওপরেই থাকুক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজন যে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'Life of Mutty Lall Seal', নরেন্দ্রনাথ লাহার

'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি' (১ম খণ্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড) রনবীর রায়চৌধুরীর 'Glmimpses of Old Calcutta, Period 1839-50' প্রভৃতি পুস্তকাদির পাশাপাশি নামের নিবন্ধগুলি আর সর্বোপরি "Hira Bulbul « puronokolkata." Purono Kolkata (blog), https://puronokolkata.com/tag/hira-bulbul/, ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান তথ্য এই পুস্তকটি লিখতে অপরিমেয় সাহায্য করেছে। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো ভাষা আমার নেই।

পরিশেষে বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে যে এই পুস্তকটির প্রকাশক শ্রীশংকরীভূষণ নায়ক মহোদয়ের উৎসাহদানের ফলে ও তার পাশাপাশি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় এই পুস্তকটি লেখা সম্ভব হয়েছে। শ্রীনায়ক মহোদয়ের প্রতি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সেই সঙ্গে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী পূরবী মল্লিকের প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞ এইজন্য যে তিনি আমাকে সাংসারিক দায়দায়িত্ব বহন থেকে সাময়িক ভাবে অব্যাহতি না দিলে যথাসময়ে পুস্তকটি লেখার কাজ শেষ করার কাজ সম্ভব হত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এখন বইটি পাঠকের ভালো লাগলে পরিশ্রম সার্থক হল বলে মনে করব।

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০১৯

নিবেদক
জলধর মল্লিক

॥ বৈদেশিক বাণিজ্যে সেকালের বাঙালি ॥

বাণিজ্যে বাঙালি বললে—অনেকেই ঘোরতর অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন হয়তো। আজকের খণ্ডিত এই বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে কথাটা অবিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক। আজকে কথাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও, একসময় বাংলা আর বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের বহু এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা সেকালের বৃহৎ বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চালাত। আগে এই অঞ্চলটি চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ভাগগুলির নাম ছিল—পৌণ্ড্রবর্ধন, রাঢ়, বঙ্গ ও সমতট। বাংলার বণিকদের জাহাজ সমুদ্রপাড়ি দিয়ে পণ্য-আমদানি-রপ্তানি করত চিন, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মলাক্কা, সুমাত্রা, এমন কি রোমানদের বন্দরেও। জিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই বৈদেশিক বাণিজ্যের হাতে খড়ি হয় বাঙালি বণিকদের। তার অর্জস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সেইসব জায়গায় যেখানে একসময় বড়ো বড়ো বন্দর ছিল, যেমন—তাম্রলিপ্ত বা তমলুকে, চন্দ্রকেতু গড়ে, বাহিরিতে। এই তাম্রলিপ্ত কথাটির সঙ্গে তামার একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। তাম্রযুগে এই বন্দরের সৃষ্টি হয় সম্ভবত। বোলপুরের পাণ্ডরাজার ঢিবি ওইযুগের সাক্ষ্য বহন করে বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। সেই সময় তামার সব থেকে বড়ো তামার খনি ছিল ধলভূমে। তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে এই তামা ক্রিট দ্বীপ আর ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হত। এক সময় বাঙালি বিশ্বের দরবারে গঙ্গারিডি সভ্যতা বলে পরিচিত ছিল। গ্রিক রাজদূত

মেগাস্থিনিসের লেখা ইন্ডিকাতে এই সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতু গড়ের কাছে প্রাচীনযুগে যে বন্দর ছিল, সেই বন্দরে যে রোমানরা যে আসত বাণিজ্যের কারণে তার কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

এইসব ব্যবসাবাণিজ্যের উল্লেখ আছে খ্রিস্টপূর্বকালে রচিত পৌরাণিক কাহিনিগুলিতে, উপকথায়। বাঙালির বৈদেশিক বাণিজ্যের হদিশ পাওয়া যায় চাঁদ বণিকের পালার মতো কাব্যে, কথিকায়। হদিশ পাওয়া যায় আরব, পারস্য, চিন, ইউরোপ থেকে আসা পর্যটকদের লেখা ভ্রমণকাহিনিতে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণ আছে ইবনবতুতা, হিউয়েন সাঙ, মা হুয়ান, নিকলো কন্টি, ট্যাভারনিয়েরের মতো মধ্যযুগে আসা বিদেশি পর্যটকদের লেখায়। ইবনবতুতা ঢাকার কাছে সোনারগাঁও বন্দর থেকে জাহাজে উঠে সামান্দার বন্দর (বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর) হয়ে শ্রীলঙ্কা যান। সেখান থেকে নিজের দেশে অন্য জাহাজে চড়ে যান। এই জলপথ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে জাহাজ চলাচলের পথ। তেমনি কিছু প্রস্তরলিপি, পুরাতন মুদ্রা আর প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাতে এতটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পরই বাংলার ব্যবসাবাণিজ্যের ধারা গড়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর বাংলায় জনপদের জন্ম হতে থাকে। জনপদ, মহাজনপদ না থাকলে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্ম, বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটানো।

নদীমাতৃক বাংলার গঙ্গা, সরস্বতী, রূপনারায়ণ, বিদ্যাধরী, পদ্মার মতো নদীগুলির পাশাপাশি অজস্র ছোটোখাটো বহমান

সেকালের নদনদীগুলি বাংলার বন্দরে বন্দরে পণ্য পরিবহনে, দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রসারে সাহায্য করে। বঙ্গোপসাগরে সহজে যাওয়ার নদীপথগুলি সমুদ্র পথে বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ুস্রোতে ভর করে শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলিতে সমুদ্রপথে যাওয়া আর কয়েক মাস বাদেই উলটো দিকে প্রবাহমান মৌসুমী বায়ুর সাহায্য নিয়ে বাংলায় আবার ফিরে আসার সুযোগ থাকায় বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। পাশাপাশি মাদ্রাজ (আজকের চেন্নাই), বোম্বাই (আজকের মুম্বাই) বন্দরেও জাহাজ যেতে থাকে বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী তমলুক, পরে সাতগাঁও, তারও পরে হুগলি, চট্টগ্রাম, ঢাকার সোনার গাঁও বন্দর থেকে। কলকাতা বন্দরের সৃষ্টি হয় অনেক পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে।

প্রাচীন যুগে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের শুরু ভারতের অন্যান্য অংশের মতো কৃষিকে ভিত্তি করে। বাংলার জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি যেমন কৃষিজ, বনজ সম্পদের সৃষ্টি করেছে, তেমনি এই সম্পদকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বাংলার বিশ্ববিখ্যাত হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বৈদেশিক চাহিদার পাশাপাশি ভূপ্রকৃতি আর জলবায়ু, যার কথা আগেই বলা হয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্যে বাঙালি বণিকদের টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। প্রেরণা এসেছে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক রাজনীতি থেকেও।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে এইটুকু বলা যায় যে খাদ্যশস্য, বিশেষ করে ধানই ছিল বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের আদি পণ্য। উর্বরতার কারণে চাহিদার তুলনায় ধান বাংলায় অনেক বেশি উৎপন্ন হত। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার

পুন্দ্রনগরে (বর্তমান নাম মহাস্থান) ধানের রপ্তানি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে জনপদ গড়ে ওঠে। চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপ্ত বা তমলুকে প্রাপ্ত টেরাকোটা সিল থেকে প্রমাণ মেলে যে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত এই পণ্য নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য বহাল ছিল। চতুর্দশ শতকে পর্যটক ইবনবতুতার ভ্রমণকাহিনিতেও বাংলা থেকে মালদ্বীপে সেখানকার কড়ির বদলে ধান রপ্তানির উল্লেখ আছে। উত্তরবঙ্গে প্রচুর আখ উৎপাদন হত। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চিনি তৈরির জন্য বাংলা থেকে আখ রপ্তানি করা হত সে সব জায়গায়। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে তমালপত্র বা তেজপাতা, আর সুগন্ধী তেল বিদেশে রপ্তানি করা হত সুদূর ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে রোমানদের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে। তেজপাতা, সুগন্ধী তেলের ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে এগুলি বাংলায় আমদানি করে সেগুলি পুনরায় রপ্তানি করা হত বিভিন্ন জায়গায়। চিন থেকে রেশম বস্ত্র আমদানি করে রপ্তানি করার কথাটিও জানা যায় বিদেশিদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে। অর্থাৎ আমদানি করে রপ্তানি করার ব্যবসাও বেশ বেড়ে উঠেছিল। বাংলার বণিকদের কোষাগার ভরার পাশাপাশি বাংলারও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে কম দামে কেনা পণ্য ইংলন্ডে আমদানি করে সেগুলি আবার মার্কিনমুলুকের মতো তাদের উপনিবেশগুলিতে রপ্তানি করে বিপুল লাভ করত।

বাংলায় উৎপাদিত যে পণ্যটি বিদেশের বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে থাকে, সেটি হল মসলিন কাপড়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উচ্চমানের এই কাপড়ের উল্লেখ আছে। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকেও বাংলার মসলিন, রেশমবস্ত্র বিভিন্ন দেশে যেমন বিক্রির কথা জানা যায়,

তেমনি এই সব পণ্য ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে বিক্রি হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন অনেকেই। ওষুধে ব্যবহার করার জন্য আসাম থেকে আনা ধুনো আর গণ্ডারের শিং বাংলার বণিকেরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রপ্তানি করত আরবীয় দেশগুলিতে। কামরূপ থেকে ধুনো আসত বলে আরবীয়রা নাম দিয়েছিল এর কামারুনি। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে বাংলা থেকে যুদ্ধের ঘোড়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হত তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। এইসব ঘোড়া আসত মধ্য এশিয়া থেকে কাবুল হয়ে উত্তর ভারতে। সেখান থেকে আবার চালান করা হত বাংলার বন্দরে বিদেশে রপ্তানির জন্য। ৭৫০ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাল আর সেন বংশীয় রাজারা বাংলায় রাজত্ব করতেন। তাদের সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনেও যুদ্ধের ঘোড়া আমদানি করা হত। সুতরাং দীর্ঘদিন ধরেই যুদ্ধের ঘোড়া আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা বহাল ছিল। পঞ্চদশ শতকে বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর থেকে চিনে মিংদের রাজত্বকালে যে যুদ্ধের ঘোড়া জাহাজযোগে সেদেশে বাংলার বণিকরা রপ্তানি করতেন, তার উল্লেখ আছে চৈনিক গ্রন্থে।

দেখা যাচ্ছে, বাংলার বণিকেরা বিদেশের বাজারে খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, মসলিন, রেশম বস্ত্র, অন্যান্য জাতীয় কাপড়, তেজপাতা, সুগন্ধী তেল, ঘোড়া, গণ্ডারে শিং, হস্তশিল্পজাত সামগ্রী বিদেশের বাজারে এদেশ থেকে রপ্তানি করতেন বাংলার বণিকেরা এইসব সামগ্রীর বিনিময়ে মালদ্বীপের মতো দেশ থেকে ভালো জাতের কড়ি আমদানি করতেন ওই বণিকেরা। এই কড়ি বাংলার বাজারে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হত। এছাড়া, তারা নিয়ে আসতেন বিভিন্ন দেশ থেকে সোনা আর রূপো। তখনকার বাংলার বিত্তবানরা অলংকার হিসাবে এই ধাতুগুলি ব্যবহার